ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 710-720
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.283

মধুসূদন দত্তের সাহিত্যের ভাষাবয়ন

সঞ্জিৎ মণ্ডল, *অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.03.2026; Accepted: 19.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Madhusudan Dutta was a milestone in the history of Bengali literature and also a pioneer of many genres in Bengali literature. He was a successful playwright who wrote both historical tragedies and farces. He wrote in many poetic forms, including narrative, epic, epistle, didactic poems and lyrical poetry demonstrating his versatility. Madhusudan Dutta also experimented with meter. Inspired by the western blank verse, he introduced 'Amitrakkhor Chhando' in Bengali poetry along with sonnet, payar and lachari. Madhsudan wrote and translated works into English. He assimilated and imbibed different styles of western literature and presented them in the traditional way in bengali. He was a true polyglot. Payar was one of the main strengths of his poetry. He also experimented with words in many ways. Madhusudan Dutta was enlightened by the Bengal Renaissance of the 19th century, and his characters also reflect influences from that period. He had to develop the dialogues for the characters of his plays considering the vast variety of their personalities, social class, moral stands, choice of words and dictions. Therefore, it was necessary for him to articulate his language with precision. He carefully selected each word to ensure that the dialogue suited the spirit and emotion of the character and genre. This essay will elaborate the linguistic features of his writings mentioned above.

Keywords: Madhusudan Dutta, Literature, Genre, Linguistics, Persona

ভাষা ভাবের প্রকাশ মাধ্যম। ভাব, বিষয় নির্মাণ করতে হয়, কখনো তা নির্মিত হয়। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহিত্য, বাঙালি জাতি, সংস্কৃতি গঠিত হয়। সুদূর নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার জন্ম, কিন্তু তার নির্মাণপর্ব চলেছে দীর্ঘকাল। আবার নবম-দশম শতাব্দীতে আমরা যে বাংলা ভাষা পেয়েছি, অনেক বাঁক বদলের মধ্য দিয়ে তা বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। সময়, রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, ব্যক্তিত্ব সেই বাঁক বদলের নিয়ামক। বাংলা তথা ভারত সংস্কৃতির মৌল বিশেষত্ব তার গ্রহণ উন্মুখ মানসিকতা। সেই গ্রহণের ফলেই বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদলটি গড়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত। এই শাসনকার্য ও ধর্ম প্রচারের সূত্রেই বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্য অনুবাদের পরিচর্যা ও অনুশীলনের সূচনা হয়। উনিশ শতকের সূচনায় একদিকে বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্যের নবনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ চলে। অন্যদিকে ইংরেজি ভাষার, সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ জন্মে। পাশ্চাত্যের ভাষা, সাহিত্যের

প্রতি, সাহিত্য পাঠের প্রতি প্রবল আগ্রহ সূচিত হয় বাঙালিদের মধ্যে। বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্য ভাষা আয়ত্ব করেছিলেন। আমাদের যা কিছু ঐতিহ্য সেগুলি এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্যের বিষয়, আঙ্গিক, প্রকরণ, শ্রেণি আত্মীকরণ করে বাংলা ভাষা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াসী হলেন। বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের যে একটি গৌরবময় অধ্যায় আছে তা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার দায়ও অনেকে অনুভব করলেন। এরকমই একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব মধুসূদন দত্ত।

বাংলা গদ্যের সূচনা হয়েছে। গদ্যের ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে, হয়েছেও। কিছু নকশা জাতীয় রচনা গদ্যে লেখা হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের মুখের ভাষা তখনও সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে না। যাত্রা থেকে নাটকে রূপান্তর পর্ব চলেছে অথচ তা সম্পূর্ণ নয়। খণ্ডকবিতা লেখা হয়েছে, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের আদর্শ রূপ তখনও গঠিত হয়নি। কাব্যের অসংখ্য রূপ আছে। সেই বৈচিত্র্য আসছে না, বাংলা ছন্দের বিবর্তন থমকে আছে, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে, কিন্তু বাংলা থেকে ইংরেজিতে সেভাবে আসছে না— এরকম এক সময়ে ধূমকেতুর মতোই আবির্ভূত হলেন মধুসূদন দত্ত। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষার আশ্রয়ে সাহিত্য রচনা করলেন। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত দিক থেকেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর সাহিত্য অভিনবত্বের দাবি রাখে। কত নতুন মানুষ, পুরনো মানুষ, পুরনো অথচ নতুন ভাবে নির্মিত মানুষের সাক্ষাৎ এই সময় পর্বে। তাদের চলন বলন সংস্কৃতি আলাদা। তাদের কথোপকথনের ভাষা আলাদা। এই ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে সাহিত্যে রূপদান প্রয়োজন। আবার প্রতিটি সংরূপের সাহিত্যের শ্রেণির জন্য পৃথক ভাষাবয়ন প্রয়োজন। মধুসূদন ঐতিহাসিক ট্রাজিক নাটক লিখলেন, লিখলেন পৌরাণিক নাটক, প্রহসন, সামাজিক নাটক। নাটকের শ্রেণি আলাদা, প্রেক্ষিত আলাদা, পাত্র-পাত্রীও আলাদা। তাই ভাষাও পাল্টেছে প্রতি ক্ষেত্রে। আখ্যানকাব্য, সাহিত্যিক মহাকাব্য, পত্রকাব্য, সনেট, ওড্ জাতীয় রচনা, নীতিগর্ভ কবিতা লিখেছেন— তারও চরিত্র, পরিবেশনরীতি পৃথক। তাই চরিত্রানুযায়ী, প্রেক্ষিত অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগ হয়েছে। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের নতুন বিষয়-প্রকরণের জন্য মধুসূদনকে ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে।

মধুসূদনের স্বপ্ন ছিল ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব ভুবন প্রতিষ্ঠা করা। তার প্রয়াসও ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে অমৃত ভাণ্ডার আছে তা খনন করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দায়ও অন্তরে অনুভব করেন। তাই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। মধুসূদন দত্ত বহু ভাষাবিদ। পিতা রাজনারায়ণ দত্তের কাছে ফারসি ভাষা শিখেছেন। বিশপ কলেজের সাধারণ বিভাগের ছাত্র হিসাবে তিনি গ্রিক, লাতিন, হিব্রু ভাষা শেখার সুযোগ লাভ করেন। কুমারস্বামীর কাছে শিখেছেন সংস্কৃত ভাষা। গৌরদাস বসাককে লেখা এক চিঠিতে তাঁর ভাষা যাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন—

> "Here is my routine. 6 to 8 Hebrew, 8-12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telugu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my father's?"[১]

তাঁর প্রাত্যহিক দিন যাপনে সকাল থেকে রাত্রি হিব্রু, গ্রিক, তেলুগু, সংস্কৃত, লাতিন, ইংরেজি ভাষার অনুশীলন চলে। অথচ তাঁর মাতৃভাষা, পিতৃভাষা অবহেলিত। বহুভাষা চর্চার সুযোগ হয়েছিল বলেই তাঁর সাহিত্য, সাহিত্যের ভাষায় বৈচিত্র এলো। বিভিন্ন ভাষায় রচিত সাহিত্য, সাহিত্যের আঙ্গিক, দর্শন আত্তীকরণ করেই বাংলা ভাষার নতুন আদল নির্মাণ করলেন। হিন্দু কলেজ, কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, বিশপস কলেজ, তাঁর বন্ধুবর্গ, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ, মনেপ্রাণে ইংরেজ হওয়ার আকুতি, দাম্পত্য, বিলেত যাত্রা— তাঁর সাহিত্য রচনায় বৈচিত্র এনেছে। সাহিত্যের ভাষা চয়নে ব্যক্তিগত জীবনের ছাপ প্রত্যক্ষ করি।

আমরা পূর্বেই বলেছি, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের মাইলফলক। তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্যের নতুন সংরূপ, নতুন শ্রেণির সূচনা হয়েছিল। প্রতিটি সংরূপ, শ্রেণির জন্য তাকে পৃথক চরিত্র সৃজন করতে হয়েছে। চরিত্রানুযায়ী ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে। নতুন ভাব এসেছে। সেই ভাব রূপায়ণে ভাষাকেও সেইভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়েছে। পাশ্চাত্যের ফার্স এর অনুসরণে বাংলা প্রহসনের জন্ম। মধুসূদন দুটি প্রহসন রচনা করলেন— 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে সমকালে যে নব্যবঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটল তাদের জন্য পৃথক ভাষাবয়ন প্রয়োজন ছিল। এই যুবক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, তাদের চাওয়া পাওয়া, আচরণ ভাষারূপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বারবিলাসিনীর ভাষা, সারজনের ভাষা, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সদস্যদের ভাষা, গৃহস্থ বধূদের ভাষা, বয়োজ্যেষ্ঠ সংস্কারপন্থী মানুষের ভাষা আলাদা। সেই চরিত্রানুসারী ভাষাই নির্মাণ করলের মধুসূদন। নবকুমার, কালীনাথ, মহেশ, বলাই, চৈতন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তাদের ভাষা সংলাপে তাই ইংরেজি শব্দ অনায়াসেই স্থান পেয়েছে।

"নব । সভাটা দেখছি এবলিশ কত্যে হলো।"[২]

"কালী । যখন আমাদের সাবস্ক্রিপশন লিস্ট অতি পুওর ছিল।"[৩]

"মহেশ । হিয়র, হিয়র, আমি এ মোসন্ সেকেন্ড করি।"[৪]

"বলাই । হা, হা, হা এতে দেখছি কারো অবজেকশন নাই, একবার নেম্ কন্ ব্রাভো!"[৫]

সম্বোধনের ভাষা পাল্টে গেল ('হিয়র হিয়র, জেন্টলম্যান')।

এই সময়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। দুই নাটকেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন্ত ভাষা রূপ পাচ্ছে। 'নীলদর্পণ'-এর নীলকর সাহেবের ভাষা আর 'একেই কি বলে সভ্যতা?'-এর ইংরেজ সার্জনের ভাষার কোন পার্থক্য নেই। চৌকিদার ও লেঠেল বাহিনীর ভাষাও এক। ক্ষেত্রমণি, পদী ময়রানীর ভাষার সঙ্গে বারবিলাসিনীদের ভাষার খুব একটা পার্থক্য নেই।

বারবিলাসিনীর ভাষা: "আমি তেমন বান্দা নই, বাবা, এই বয়সে কত শত বেটার নাকের জলে চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো।"[৬]

ইংরেজ সারজন: "হাল্লো! চওকিডার! এক আডমি ওঢার ডৌরকে গিয়া নেই? আলবট্ গিয়া, হাম ডেকা। টোম জলদি ডওড়কে যাও, উস্টরফ ডেকো, যাও - যাও- জলডি যাও। ইউ সুওর।"[৭] (দ>ড, ধ>ঢ, ট>ত, ধ্বনি পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা হিন্দি ইংরেজি সমন্বয়ে এ ভাষা গঠিত।)

চৌকিদার: "নেই ছাব, হামতো কুছ নাহি দেখা।"[৮] (চৌকিদার হিন্দি ভাষার আশ্রয়ে তার ভাব প্রকাশ করে)

বাবাজি সন্ন্যাসী চরিত্র। তাই তার ভাষা আলাদা। তাতে আধ্যাত্মিকতা, ধার্মিকতা আছে। বারবিলাসিনী, মাতালের সংস্পর্শে তার ধর্ম, পবিত্রতা নষ্ট হতে যাচ্ছে। তার ভীরুসুলভ মানসিকতার প্রকাশ সংলাপের ভাষায়— "এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?"[৯] কিংবা, "রাধে কৃষ্ণ! আঃ বাঁচলেম, আজ কি কুলগ্নেই বাড়ি থেকে বের্য়েছিলেম।"[১০] নববাবু, কালীনাথসহ বঙ্গীয় নব্যযুবকদের ভাষায় অশ্লীলতা আছে। তাই অশালীন অমার্জিত শব্দ তারা ব্যবহার করে থাকেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যদের কথোপকথনে সভার একটা চিত্র আমাদের সম্মুখে দৃশ্যায়িত হয়। নবজাগরণের আলোকে আলোকিত হয়ে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রিফরমেশনের দায়িত্ব নিলেন। কিছু গদ্য প্রবন্ধে এবং বাস্তব জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। মধুসূদন দত্ত সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজ শোধনের দায়ভার গ্রহণ করলেন। এই প্রহসনে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় সভ্যগণের প্রতি নববাবুর দীর্ঘ ভাষণ রয়েছে। ভাষণধর্মী বাক্যের ফর্ম নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। যথা—

> "নব: জেন্টালম্যান তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর- তাদের স্বাধীনতা দেও- জাতভেদ তফাৎ কর- আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তাহলে এবং কেবল তাহলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংল্যান্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের টক্কর দিতে পারবে— নচেৎ নয়।"[১১]

সম্ভাষণসূচক বাক্য এল, উপদেশ, অনুরোধমূলক, উদ্দীপনামূলক ভাষণকলা অন্তর্ভুক্ত হলো। অসংখ্য 'ড্যাশ' চিহ্ন আনলেন অনেকগুলি বিষয়কে ভাষণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

ড্যানিয়েল জোনস ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম IPA তথা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা প্রবর্তন করেন। আমরা কোন শব্দকে যেভাবে উচ্চারণ করি IPA তে সেভাবেই লেখা হয়। তারপর সেগুলোকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালায় লিপ্যন্তর করা হয়। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় পূর্বে মধুসূদন উচ্চারণ অনুসারী বানান লিখলেন। তিনি ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করেছেন। তার প্রোনানসিয়েশন কেমন হবে সেই অনুযায়ী বানান লিখেছেন। এই অভিনব প্রয়াস তাঁর ভাষাতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য।

যথা: "আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্যে এলো?"/ বোয়ে গেল..." [১২]

প্রোবিজন জমাতে কসুর করে?/ কর্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই..."[১৩]

"ও এট করার কি আছে ?"[১৪]

"এখন সত্তি কি বলবে বল দেখি?"[১৫]

"কি আপোদ,"[১৬]

নতুন বিষয়, সংস্কৃতি আমদানি হচ্ছে বাংলা ভাষায়। স্বভাবতই নতুন শব্দ পাঠকের কাছে অপরিচিত। তাই মধুসূদন অপরিচিত শব্দের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করাচ্ছেন। বাক্য সংলাপে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শব্দের অর্থ করে দিচ্ছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন থেকে একটি নমুনা—

"চৈতন: তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই: সাকী আবার কি?

চৈতন: যে মদ দেয় পারসিতে তাকে সাকী বলে।"[১৭]

এ যেন অন্যতর অভিধানবিজ্ঞান। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আমরা পরবর্তীতে দেখেছি। পাশ্চাত্যের প্রভাবে আধুনিক যুগে একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট। মানবীবিদ্যাচর্চা তথা ওমেন স্টাডিজ প্রতিটি বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানেই আছে। পুরুষের সম অধিকার, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, বুদ্ধিতে সমান পারদর্শিতা পাশ্চাত্য দেশ ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের দ্বারাই বেশি কার্যকরী হয়েছিল প্রথমে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যেমন সমাজের নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, মধুসূদন তাঁর সাহিত্যকে আশ্রয় করে নারীর কণ্ঠকে প্রতিষ্ঠা দিলেন। সাহিত্যের নামকরণেই তার প্রমাণ নিহিত আছে। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, রিজিয়া, রত্নাবলী এই নামের অন্তরালে পুরাণ, ইতিহাসের সেই নারী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন ঘটেছে মধুসূদনের হাতে। নবজাগরণের ধারায় স্নাত হয়ে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতে চেয়েছেন। চরিত্র রূপায়ণে তাই নারীর পৃথক ভাষা বয়ন করতে হয়েছে। এই ভাষায় একটি প্রতিস্পর্ধিতার ভাব এল, প্রতিবাদ এল, নস্যাৎ করার মাধ্যমে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আদল এলো। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে হরকামিনীর সংলাপে এই প্রতিবাদী সংলাপ পেলাম—

> "হর। তা ভাই দেখ দেখি, এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলিই বা কি। ঠাকুর-ঝি! তোকে বলতে কী ভাই, এসব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) ছি। ছি। ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন

সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল। মদ মাস খ্যেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?"[১৮]

নারী তার মতামত প্রকাশ করছে, অসংখ্য প্রশ্ন করছে। সভ্যতা, সমাজ সম্পর্কে তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করছে। সাহিত্যে তা নতুনই বটে। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়, মদনিকার কণ্ঠে মধুসূদন প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন। নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম নিদর্শন এই নাটক। এই ক্ষমতায়নের ভাষা মধুসূদন নির্মাণ করলেন।

"মদনিকা। যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না যে, স্ত্রী লোকের শক্তিকুলে জন্ম।... এজন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা কোরো না।"[১৯]

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রমীলার উক্তিতেও এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে দেখি— "রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, —/ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?"[২০]

বাংলা সাহিত্যে পত্রকাব্য ছিল না। মধুসূদন দত্ত ইতালীয় কবি ওভিদের 'হিরোইডস' বা 'এপিস্টল অব হিরোইনস' পত্রকাব্যের আদলটি বাংলা সাহিত্যে উপহার দিলেন। পত্রকাব্যের পৃথক এক বয়ান আছে, পৃথক এক ভাষাবৈশিষ্ট্য আছে। আর পত্রপ্রেরক যদি একজন প্রসিদ্ধা নারী হন এবং পত্রপ্রাপক যদি হন কোনো রাজা বা মহারথী, তাহলে তার ভাষাবয়ানও পালটে যাবে। মধুসূদনের হাতেই সেই পত্রকাব্যের ভাষা নির্মিত হল। পত্রে সম্বোধন থাকে, সম্ভাষণ বা সম্বোধনের ভাষা এল— "বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে/ রাজেন্দ্র!"[২১] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা] "কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,/ তোমারে অভাগী তারা?"[২২] [সোমের প্রতি তারা] "শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষিকেশ তুমি,/ যাদবেন্দ্র,"[২৩] [দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী]। কখনও কখনও সম্বোধন পাল্টে যায় পত্রপ্রেরকের মানসিক অবস্থান ও পত্রপ্রাপকের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে। সেখানে বিনয় নয়, অন্তরের ক্রোধ, যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়েছে পত্রের প্রথম থেকেই। 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' কিংবা 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রে এ ধরনের শব্দ-শরনিক্ষেপ লক্ষ করি— "এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে"[২৪] কিংবা "বাজিছে রাজতোরণে রণবাদ্য আজি,/ হ্রেষে অশ্ব; গর্জে গজ; উড়িছে আকাশে/ রাজকেতু; মুহূর্মুহূঃ হুঙ্কারিছে মাতি/ রণমদে রাজসৈন্য; কিন্তু কোন্ হেতু?"[২৫] রাগে, অভিমানে, যন্ত্রণায় সরাসরি প্রশ্ন। আর এ দুটি পত্রিকায় অসংখ্য প্রশ্নবাক্য এসেছে। কেকয়ী তাঁর স্বামী দশরথের কাছে, জনা তাঁর স্বামী নীলধ্বজের কাছে অসংখ্য প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে চান এই আনন্দ উৎসব আয়োজনের কারণ কী। স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী প্রশ্ন রাখবেন, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন— এ ভাবনা তো সাহিত্যে নতুন। সাহিত্যের ভাষায় তা নতুনরূপে প্রতিষ্ঠা পেল—

"কেন বা উড়িছে ধ্বজা প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজ পুরনারী-ব্রজ
মুহূর্মুহূ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?"[২৬]

শুধু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা চিহ্নই নয়, প্রশ্নবাচক শব্দের বারবার ব্যবহারে জিজ্ঞাসার তীব্রতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

স্ট্রীম অব কনশাসনেস বা চেতনাপ্রবাহরীতি আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে লক্ষ করেছি। মধুসূদন চেতনাপ্রবাহরীতির বাক্য সৃজন করলেন। বিশেষ করে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র 'সোমের প্রতি তারা', 'দুষ্মন্তের

প্রতি শকুন্তলা' কিংবা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সর্গ 'অশোকবন'-এ এই রীতির সাক্ষ্য পাই। আবার 'লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা' পত্রিকায় চেতনাকে সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। সেজন্য ভবিষ্যবাচক ক্রিয়াপদের সাক্ষাৎ পাই।

"সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে
অর্পিবেন শুভক্ষণে রক্ষঃ-কুল-পতি
দাসীরে কমলপদে। কিনিয়া, নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা; দাসী-ভাবে সেবিবে এ দাসী!"[২৭]

আবার চেতনা বর্তমান থেকে অতীতে সঞ্চারিত হবার অনুষঙ্গও আছে। সেক্ষেত্রে পত্রপ্রেরক, পত্রপ্রাপককে অতীত স্মৃতি স্মরণ করাতে চান। এটাও পত্রপ্রাপকের কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের একটা কৌশল। সেক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ হয় অতীত কালের। যথা:

"যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে, ভাসিলা যেন আনন্দ সলিলে!"[২৮]

এক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি প্রধান বিশেষত্ব— ভাব এক পংক্তি থেকে পরবর্তী পংক্তিতে প্রবাহিত হয়। চেতনাপ্রবাহরীতির বাক্যেও ভাব বর্তমান থেকে অতীতে বা বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে প্রবাহিত হয়ে যায়।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'কে সামনে রেখেই একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— সম্মতি আদায়ের শিল্পকলা। কীভাবে প্রেমিক পুরুষ, স্বামীর কাছ থেকে সম্মতি আদায় করে নিতে হয় তার একটি আদল বাংলা সাহিত্যে আনয়ন করলেন। কখনও অনুনয়, কখনও প্রতিবাদের মাধ্যমে, কখনও ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেইল বা অপপ্রচারের ভয় দেখিয়ে, সমাজ-অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নারী তাঁর সম্মতি আদায় করতে চেয়েছে। এই সম্মতি আদায়ের জন্য ভাষা নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। পৃথক এক কথনশৈলীই নির্মিত হল তাঁর হাতে। কখনও অনুনয়, কখনও প্রতিবাদের মাধ্যমে, কখনও অপপ্রচারের ভয় দেখিয়ে (পরম অধর্মাচারী রঘুকুলপতি), অসময়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে, গৃহত্যাগ করার ভয় দেখিয়ে, সমাজ-অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, অসংখ্য প্রশ্নবাণে জর্জতিত করে, শুধু ব্যক্তি নয়, একটি পরিবার, বংশকে আক্রমণ করে নারী, পুরুষের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে চেয়েছেন।

তাই মধুসূদনকে নির্মাণ করতে হল আত্মনিবেদন-আত্মসমর্পণের ভাষা, বিনয়ের ভাষা, ত্যাগের ভাষা, সংযম-ধৈর্যের ভাষা, আত্মসমীক্ষণের ভাষা, অপপ্রচারের ভাষা, হুমকির ভাষা, নিন্দার ভাষা, পৌরুষ জাগ্রত করার ভাষা, চেতনাপ্রবাহরীতির ভাষা, মনস্তত্ত্বের ভাষা, সর্বোপরি পত্রের ভাষা, নারীর ভাষা, পুরুষেরও ভাষাবয়ন।

আত্মসমর্পণের ভাষা— 'জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!'[২৯] [সোমের প্রতি তারা] 'যথা যাও যাব; করিব যা কর;— / বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!'[৩০] 'দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে, প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!'[৩১] [লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা]

বিনয়ের ভাষা— "কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,/ অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?"[৩২] [দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী]

ত্যাগের ভাষা— "আরম্ভি সত্বরে/ সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!"[৩৩] [সোমের প্রতি তারা]। "এ বেশ ভূষণ ত্যজি, উদাসীনী বেশে/ সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!"[৩৪] [লক্ষণের প্রতি শূর্পনখা]

সংযম-ধৈর্যের ভাষা— "জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে সহজে!"[৩৫] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]

আত্মসমীক্ষার ভাষা— "না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভারে!/ নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্তুল কদলী-/ সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি/ যাহায়,"[৩৬] [দশরথের প্রতি কেকয়ী]

অপপ্রচারের ভাষা— "যেখানে যাব, কহিব সেখানে/ পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি!"[৩৭]

হুমকির ভাষা— "কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য ধরি?/ ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;"[৩৮] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

নিন্দার ভাষা— "হায়, ভোজবালা কুন্তী— কে না জানে তারে,/ স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জুনে/ (কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ, রাজরথি,/ নরনারায়ণ-জ্ঞানে?"[৩৯] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

পৌরুষ জাগ্রত করার ভাষা— "সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—/ প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—/ নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে?/ এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি।"[৪০] [নীলধ্বজের প্রতি জনা]

চেতনাপ্রবাহরীতির ভাষা— "ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,/ নরেন্দ্র; যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,/ লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী;—/ যথায় সহসা তুমি প্রবেশি, জুড়ালে/ বিষম বিরহজ্বালা!"[৪১] [দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা]

মনস্তত্ত্বের ভাষা— "কি লজ্জা! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,/ লিখিলি এ পাপ কথা"[৪২] [সোমের প্রতি তারা] পুরুষের ভাষা নারীর বয়ানে বিবৃত হয়েছে কখনও কখনও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' উপন্যাসে 'আঁতের কথা'কে সাহিত্যের পাতায় স্থান দিলেন। তার বহু পূর্বে মধুসূদন তাঁর সাহিত্যের চরিত্রের বয়ানে অন্তরের কথাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। মধুসূদনের প্রথমা স্ত্রীর প্রতি তিনি অবিচার করেছেন যথেষ্টই— এই আত্মসমালোচনা তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথমা স্ত্রী যদি চিঠি বা পত্র লিখতেন তার বয়ান কেমন হবে— সে উদ্দেশ্যেই 'বীরাঙ্গনা কাব্য' লেখা। সেক্ষেত্রে প্রতিটি নারীর অন্তর মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত পত্রের ভাষায়। পত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাছের মানুষদের উদ্দেশেই লেখা হয়। তাতে নিজেকে অনেক বেশি উন্মোচন করা যায়। তাতে ব্যক্তি মধুসূদনকেও যেন পাই আমরা। 'সোমের প্রতি তারা' পত্রিকায় তারা যখন বলেন— 'নিজ রাজ্য ত্যজি,/ ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?/ সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,/ পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,/ আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী—/ কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?'[৪৩] তখন তারার কথনে মধুসূদন পরাধীন ভারতবর্ষ তথা নিজের দেশের কথাই ব্যক্ত করলেন। এই সেই আত্মকথনরীতি যা গীতিকবিতা তথা আত্মগত কবিতার মূল বিশেষত্ব, তারও পদধ্বনি শুনতে পেলাম। মধুসূদন আত্মগত কবিতা বা গীতিকবিতার জন্য ভাষা নির্মাণ করলেন। বক্তব্য পরিবেশিত হলো উত্তম পুরুষের জবানীতে। যা ছিল চরিত্রের সংলাপ, কথক লেখক তা নিজেই পরিবেশন করলেন। পুরুষ, ক্রিয়ারূপ পাল্টে গেল এই বয়ানে। 'গীতিকবিতা' শ্রেণির দুটি কবিতা রচনা করলেন— 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি'। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা'সহ অনেক কবিতাতেই এই আত্মকথন পেয়েছি। যথা:

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?"[৪৪] [আত্মবিলাপ]
"রেখো, মা, দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।"[৪৫] [বঙ্গভূমির প্রতি]

এই ভাষায় আত্মসমীক্ষণ এলো, আত্ম-সমালোচনা এলো, অন্তর মনস্তত্ত্ব এলো, ব্যক্তি-মানুষ মধুসূদন ধরা দিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ শিশুদের নীতিশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে গদ্যে আখ্যান রচনা করেছেন। গোপাল-রাখাল থেকে নানারচনার সাক্ষাৎ পাই। মধুসূদন লিখলেন পদ্যে, নামকরণ করলেন 'নীতিগর্ভ কাব্য'। সেখানে দুজন করে চরিত্র এলো। যথা— 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী', 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'অশ্ব ও কুরঙ্গ', 'গদা ও সদা' ইত্যাদি। এই কাব্যে প্রতিটিতে একটি কাহিনি বা প্লট আছে। চরিত্রদ্বয় সেই গল্প-কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সংলাপ আছে, তা পদ্যে রচিত। এছাড়া কোনও কোনও রচনায় কাহিনি কথক আছেন। যেমন— 'গদা সদা নামে/ কোন এক গ্রামে/ ছিল দুই জন। / দূর দেশে যাইতে হইল; /দুজনে চলিল।'[৪৬] এই বয়ান অনেকটাই গদ্যের কাছাকাছি। এই নীতিগর্ভ কাব্যের জন্য পৃথক ভাষাবয়ন করলেন। যদিও এই রচনাগুলি ছোটদের জন্য। তাই গল্পরস সংযোজন করলেন। 'বাল্যরচনা' শ্রেণির 'বর্ষাকাল ও হিমঋতু' নামে দুটি কবিতা লেখেন। 'গান' শিরোনামে তাল, রাগসহ দুটি রচনা— 'প্রস্তাবনা', 'উপসংহার'। আসলে কবিতার ফর্ম নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কাব্য-কবিতা কতটা ভারবহনক্ষম হয়ে উঠতে পারে বিষয়ের তারই নিরন্তর অনুসন্ধান চলেছে।

বাংলা ভাষায় সনেট ছিল না। মধুসূদন ইতালীয় সাহিত্য থেকে সনেটের রূপকল্প বাংলায় আনয়ন করলেন। নিজস্ব ঘরানায় নামকরণ করলেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। সনেট পয়ারের এবং মহাপয়ারের মাত্রাবিন্যাসে রচিত হয়। মধুসূদন পয়ারের মাত্রাবিন্যাসকেই আশ্রয় করলেন। এই কাব্যের '৩' সংখ্যক সনেট 'বঙ্গভাষা'য় কবি লিখলেন— "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;"[৪৭] তা সত্ত্বেও পরদেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে সংগ্রহ করে এনেছেন নতুন বিষয়, নতুন ভাষা, নতুন শব্দ, নতুন ছন্দ, নতুন আঙ্গিক। সনেটের জন্য নতুন করে শিল্পবিন্যাস নির্মাণ করতে হল কবিকে। আর সনেটে গভীর ভাব বা বিষয় স্থান পায়। তাই গভীর ভাব, বিষয় অনুযায়ী শব্দচয়ন করতে হল কবিকে। বাংলা ভাষা, শব্দকে আশ্রয় করেই সনেটের রূপকল্প নির্মাণ করলেন।

চৌদ্দ অক্ষরযুক্ত চরণের জন্য তাঁকে শব্দ নির্বাচন করতে হয়েছে। কখনও মাত্রা সংখ্যার সমতার জন্য শব্দকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে। কখনও প্রচলিত রূপ থেকে অপরিচিত শব্দরূপে নিয়ে গেছেন— রথ>স্যন্দন, ছন্দ মেলানোর জন্য 'ভীষণ' অর্থে 'ভীম', ক্রিয়ারূপ পরিবর্তন করছেন— 'বাস করে' অর্থে 'বাসে'। এরকম অসংখ্য শব্দ তাঁকে নতুনভাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। তাঁকে সচেতন থাকতে হয়েছে মিলবিন্যাস ও মাত্রাসমতা রক্ষায়, উপযুক্ত ভাব প্রকাশে। শব্দকে ভাঙতে হয়েছে, গড়তে হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন করতে হয়েছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়, এর শ্রেণিও পৃথক। শ্রেণিগতভাবে এটি পাশ্চাত্যের ওড জাতীয় রচনা। গ্রন্থপরিচয় অংশে উল্লিখিত— "শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম প্রসঙ্গে অনেকে অনেক প্রকার

কাব্যরচনা করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ নূতন ছন্দ ও সুমধুর নবভাব পরিপূরিত কবিতা এ পর্যন্ত কেহই রচনা করেন নাই বোধ হয়।"[৪৮] এরজন্য পয়ার ত্রিপদী, লাচাড়ী ছন্দের আশ্রয় নিলেন। নতুন করে মিলবিন্যাস রচনা করতে হল। "তিনি যে মিত্রাক্ষর কবিতা রচনায় কীরূপ পারদর্শী তা প্রমাণ করার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। মিলের পদ্ধতি যে কত বিচিত্র ও জটিল হতে পারে, কবি তা দেখিয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে নামলেন।"[৪৯]

যেমন— 'বংশী ধ্বনি' '৩' সংখ্যক স্তবক বারোটি পঙক্তিতে বিন্যস্ত। তার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম, দ্বাদশ পঙক্তির অন্তমিল আছে—রাধিকার মন—রতন—এখন—চরণ। আবার চতুর্থের সঙ্গে পঞ্চমের মিল—করি—হরি, সপ্তমের সঙ্গে অষ্টমের—স্বজনি—ধ্বনি, দশমের সঙ্গে একাদশের – কুল - কূল। অর্থাৎ মিলবিন্যাস নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, ছন্দ নিয়েও। '৩' সংখ্যক কবিতা 'যমুনা তটে'। প্রতিটি পাঁচ পঙক্তির স্তবক, কবিতা। তার মিলবিন্যাস আবার আলাদা। প্রত্যেক শিরোনামাঙ্কিত কবিতার মিলবিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য আছে। কবিতার গঠনও আলাদা রকমের। অসংখ্য নারীবাচক শব্দ আছে। আখ্যানকাব্য, মহাকাব্যের জন্যও বিষয়ানুসারী ভাষা নির্মাণ করেছেন, চরিত্রের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা নির্মাণ করেছেন।

'মায়াকানন' বাদ দিলে দুটি পৌরাণিক নাটক, দুটি প্রহসন, একটি ঐতিহাসিক নাটক বা ঐতিহাসিক ট্রাজেডি। পৌরাণিক নাটকে পুরাণাশ্রয়ী শব্দই ব্যবহার করলেন। তাতে তৎসম শব্দ, ভাবগাম্ভীর্যসূচক শব্দই ব্যবহৃত হল। 'পদ্মাবতী' নাটকে কাব্যছন্দ অমিত্রাক্ষরের সার্থক প্রয়োগ ঘটালেন। দুটি নাটকেই চরিত্রের অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহৃত হল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্র সৃজন করলেন। রাজা ভীমসিংহ, রানি অহল্যা, রাজকুমারী কৃষ্ণার ভাষার আদল আর কাল্পনিক চরিত্র ধনদাস—মদনিকা—বিলাসবতীর ভাষার আদল আলাদা। নাটকটি যেহেতু ট্রাজেডি নাটক, তাই চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এসেছে দীর্ঘ স্বগত সংলাপ। কৃষ্ণকুমারী ও বলেন্দ্রসিংহের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দীর্ঘ সংলাপ পেয়েছি। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এ জাতীয় দীর্ঘ সংলাপ পাবো। দ্বিবাচনিকতার নিদর্শন পাই কোনো কোনো চরিত্রের সংলাপে। কখনও প্রকাশ্য সংলাপ, কখনও স্বগত সংলাপের আশ্রয় নিচ্ছেন চরিত্র। স্বগত সংলাপে চরিত্রের মনের আসল অভিসন্ধি, প্রবণতা ধরা পড়ে। আর প্রকাশ্য সংলাপে আমি কীভাবে সম্বোধন করলে, কীভাবে বললে স্বার্থ চরিতার্থ হবে সেই প্রসঙ্গ স্থান পায়। যাদের অন্তর ও বাইরের সত্তা পৃথক তাদের ক্ষেত্রেই এই দুই ধরনের সংলাপ ব্যবহৃত হয়। ধনদাসের সংলাপ থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য—

"ধন। (স্বগত) আঃ, এ মাগী তো ভারী জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে? (প্রকাশ্যে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।"[৫০]

"ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশ্যে) আমি ত ভাই, তোমার হিত বৈ অহিত কখন করি নাই; তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?"[৫১]

দুই সংলাপে সম্বোধনের ভাষা আলাদা, চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আলাদা হয়ে যায়। যিনি সংলাপ বলছেন তার চরিত্রের দ্বৈততাও প্রকাশিত।

এই নাট্যসংলাপের ভাষার অপর একটি দিক লক্ষণীয়। নাট্যকার অনুষঙ্গ এনেছেন। কোনো একটি ভাব বা বিষয় বা অনুভূতি প্রকাশে প্রথাগত সংলাপ ব্যবহার না করে প্রবাদের মত অনুষঙ্গ এনেছেন। তাতে নাট্যকারের বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধির পরিচয় পাওয়া যায়। উদয়পুরের রাজা জগৎসিংহ এবং রাজসহচর ধনদাসের মধ্যে কথোপকথন তুলে আনা যেতে পারে। ধনদাস রাজার উদ্দেশে বলেছেন যে, এই নিকুঞ্জ বনের সকল ফুলেই আপনার একবার করে মধু পান করা হয়ে গেছে। বাকি রয়েছে শুধু ভেরেণ্ডা,

ধুতুরা প্রভৃতি কতক কদর্য ফুল। প্রত্যুত্তরে রাজা বলেছেন— 'সাগর কি বারিশূন্য হল না কি?' ধনদাসের উত্তর— "এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?"[৫২]

নারী আসক্তির অনুষঙ্গে অগস্ত্য মুনির সমুদ্র শোষণের অনুষঙ্গ আনা হলো। একে প্রবাদ, ভিন্ন ধরনের উপমা, রূপক অনেক নামেই অভিহিত করা যায়। এরকম অসংখ্য অনুষঙ্গ আছে। পুরাণ থেকে, প্রকৃতিজগৎ থেকে, সমাজ, বিশ্ব থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ অনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। তপস্বিনীর মতো চরিত্র অঙ্কন করেছেন নাট্যকার। যিনি দীর্ঘকাল ভারত পরিক্রমা করে জ্ঞানার্জ্জন করেছেন। তার মধ্যে একটা শুভ, মঙ্গল চেতনা আছে, তার ভাষা নির্মাণ করতে হয়েছে মধুসূদনকে। একটিও অমঙ্গলের, অশুভ ভাবের শব্দ নেই। পুরাণ থেকে দৃষ্টান্ত এনে আশ্বস্ত করার শব্দচয়ন করেছেন নাট্যকার। যেমন— জগৎ সিংহের প্রতি কৃষ্ণার আকৃষ্ট হবার ঘটনাকে তিনি বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "ঐ যে সূর্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্যদেবের পানে চেয়ে থাকে; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না।"[৫৩] বা "দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্মচক্ষে দেখে তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন?"[৫৪] প্রহসনের পৃথক ভাষা নির্মাণ করতে হল মধুসূদনকে। প্রহসনে টাইপ চরিত্র থাকে। এক-একটা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে এক একটা চরিত্র। একটি চরিত্রের ভাষা সমাজের একটি শ্রেণির ভাষা। তাই কর্তামশায়ের ভাষা, নব্য-বঙ্গীয় যুবকের ভাষা, চৌকিদারের ভাষা, বারবিলাসিনীর ভাষা, অন্ত:পুরের নারীর ভাষা, সারজনের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সদস্যদের উদ্দেশে ভাষণের ভাষা নির্মাণ করতে হয়। নারীর প্রতিস্পর্ধিতার ভাষাও নাট্যকারকে নির্মাণ করতে হয়েছে। এই প্রহসনেও অসংখ্য প্রবাদ আছে, প্রবাদকে ভাঙছেন তিনি। প্রবাদের শব্দগুলি বাক্য ব্যবহার করে তাকে বিস্তারিত করেছেন, 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনেও চরিত্রানুসারী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের যশোর, রাজশাহী জেলার আঞ্চলিক ভাষা সংলাপে ব্যবহৃত হয়েছে। হানিফ ও ফতেমার সংলাপের ভাষায় আরবি, ফার্সি শব্দ, ভক্তপ্রসাদবাবুর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। 'হেকটর-বধ' নামক গদ্য আখ্যান রচনা করেছেন, অনুবাদ করেছেন, ইংরেজিতে কবিতা, চিঠি লিখেছেন— প্রত্যেক সংরূপের জন্য তাকে পৃথক ভাষা চয়ন করতে হয়েছে। নতুন সাহিত্য প্রকরণ, সাহিত্যের নতুন শ্রেণি আনলেন। তাই চরিত্র সৃজন করতে হয়েছে প্রতিমুহূর্তে। আর প্রতি চরিত্রের জন্য পৃথক ভাষা বয়ন করতে হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। মধুসূদন রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬।
২। তদেব, পৃ. ২৩৯।
৩। তদেব, পৃ. ২৩৯।
৪। তদেব, পৃ. ২৪৬।
৫। তদেব, পৃ. ২৪৬।
৬। তদেব, পৃ. ২৪২।
৭। তদেব, পৃ. ২৪৩।
৮। তদেব, পৃ. ২৪৩।
৯। তদেব, পৃ. ২৪২।
১০। তদেব, পৃ. ২৪২।
১১। তদেব, পৃ. ২৪৮।
১২। তদেব, পৃ. ২৩৯।
১৩। তদেব, পৃ. ২৪০।
১৪। তদেব, পৃ. ২৪৬।

১৫। তদেব, পৃ. ২৪০।
১৬।তদেব, পৃ. ২৪৯।
১৭। তদেব, পৃ. ২৪৭।
১৮। তদেব, পৃ. ২৫১।
১৯। তদেব, পৃ. ৩৩০।
২০। তদেব, পৃ. ৫৬।
২১। তদেব, পৃ. ১৩৩।
২২। তদেব, পৃ. ১৩৫।
২৩। তদেব, পৃ. ১৩৮।
২৪। তদেব, পৃ. ১৪০।
২৫। তদেব, পৃ. ১৫৫।
২৬। তদেব, পৃ. ১৪০।
২৭। তদেব, পৃ. ১৪৪।
২৮। তদেব, পৃ. ১৩৬।
২৯। তদেব, পৃ. ১৩৭।
৩০। তদেব, পৃ. ১৩১।
৩১। তদেব, পৃ. ১৪৪।
৩২। তদেব, পৃ. ১৩৮।
৩৩। তদেব, পৃ. ১৩৭।
৩৪। তদেব, পৃ. ১৪৩।
৩৫। তদেব, পৃ. ১৩৫।
৩৬। তদেব, পৃ. ১৪১।
৩৭। তদেব, পৃ. ১৪১।
৩৮। তদেব, পৃ. ১৫৭।
৩৯। তদেব, পৃ. ১৫৫।
৪০। তদেব, পৃ. ১৫৫।
৪১। তদেব, পৃ. ১৩৪।
৪২। তদেব, পৃ. ১৩৫।
৪৩। তদেব, পৃ. ১৩৬।
৪৪। তদেব, পৃ. ১৮৬।
৪৫। তদেব, পৃ. ১৮৬।
৪৬। তদেব, পৃ. ১৯০।
৪৭। তদেব, পৃ. ১৫৯।
৪৮। তদেব, পৃ. ৩৫।
৪৯। তদেব, পৃ. ৩৬।
৫০। তদেব, পৃ. ৩০২।
৫১। তদেব, পৃ. ৩০৩।
৫২। তদেব, পৃ. ২৯৭।
৫৩। তদেব, পৃ. ৩১৭।
৫৪। তদেব, পৃ. ৩১৭।